অপরাজিতা

সামাজিক উপন্যাস

অপরাজিতা ২ অপরাজিতা ৩ অপরাজিতা ৪

অপরাজিতা ৫ অপরাজিতা ৬ অপরাজিতা ৭

অপরাজিতা ৮ অপরাজিতা ৯ অপরাজিতা ১০

অপরাজিতা ১১ অপরাজিতা ১২ অপরাজিতা ১৩

অপরাজিতা ১৪ অপরাজিতা ১৫ অপরাজিতা ১৬

অপরাজিতা ১৭ অপরাজিতা ১৮ অপরাজিতা ১৯

অপরাজিতা

সামাজিক উপন্যাস

শহীদ আশরাফ

http:// rokomari.com/nalonda
অথবা
ফোনে অর্ডার করতে ০১৫ ১৯৫২ ১৯৭১
হট লাইন ১৬২৯৭
অথবা
www. boibazar.com
হট লাইন ০৯৬১১২৬২০২০

অপরাজতিা	শহীদ আশরাফ
প্রকাশক	নালন্দা
	৩৮/৪ বাংলাবাজার (মান্নান মার্কেট)
	তৃতীয় তলা, ঢাকা ১১০০
স্বত্ব	তুহিন সাবের
প্রচ্ছদ	নিয়াজ চৌধুরী তুলি
প্রথম প্রকাশ	ফেব্রুয়ারি ২০২৪
মুদ্রণ	শামীম প্রিন্টিং প্রেস
বর্ণবিন্যাস	নালন্দা কম্পিউটার বিভাগ
মূল্য	৫৫০.০০ টাকা
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক	মুক্তধারা জ্যাকসন হাইট নিউ ইয়র্ক
ভারত পরিবেশক	নয়া উদ্যোগ

©	Writer
Aporajita	Shahid Ashraf
Cover Design	Niaz Chowdhury Toli
First Pubished	February 2024
Publisher	Redwanur Rahman Jewel
	Nalonda
	38/4 Banglabazar (Mannan Market)
	2nd Floor, Dhaka 1100
Price	550.00 Tk only
ISBN	978-984-98390-0-2
E-mail	nalonda71 @gmail.com

উ ৎ স র্গ

পিতামহী, জনক ও জননীকে

যাদের অকৃত্রিম পরিচর্যা ও আদর সোহাগে পুষ্ট আমার প্রতি অঙ্গ।

ঠিকানা না-ই বা বললাম। তুমি একটু এগিয়ে এলেই চিনবে। এ রাস্তার এ বাড়িটাকে কেউ বা বলে ব্যারাক— কেউ বা পাঁচ ইঞ্চি।

একটা চৌকোনা প্লটের ওপর খোপ-খোপ ঘর। গুনলে কুড়ি-বাইশখানা হবে। পাঁচ ইঞ্চি গাঁথুনি। ছাউনি অ্যাসবেস্টো এবং টালির। দূর থেকে ভয় হয়— কপাল সিরসির করে ওঠে। একটু এগোলে আর বুঝি রক্ষা নেই। পূর্ব-পশ্চিমের ঘরগুলো যেমন মুখোমুখি, তেমনি উত্তর-দক্ষিণের। প্রত্যেক ঘরের সম্মুখে হাত তিনেক চওড়া বারান্দা। ওরই একপাশে রান্নাঘর অন্য পাশে ড্রয়িংরুম। কখনো কখনো বাথরুম কখনো বা ছেলেমেয়ের পড়ার ঘর। সময়মতো ছোটখাটো গানের আসর নয়তো তাসের আড্ডা বসে। রাজনীতি, সমাজনীতি, দর্শনও বাদ যায় না। নজরুল এবং রবীন্দ্র পরিক্রমাও হয় মাঝে মাঝে।

সেদিন এক বারান্দায় দুদল স্কুলের ছেলেদের মধ্যে তো স্ট্যালিনগ্রাদের ফাইট হয়ে গেল এক সিনেমা অভিনেত্রীকে নিয়ে। বিষয়টা জটিল। তার গালের তিলটি আসল না মেকি? অবশ্য রাতে বাড়ির বুড়োদের মজলিস বসেছিল। তাঁরা একজন অভিজ্ঞকে আমন্ত্রণ করলেন প্রায় সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার থেকে; অর্থাৎ মিস্টার খানকে। হ্যাংলা গড়ন, ব্যাক ব্রাশ চুল— এককালে মিস্টার খান ছিলেন একজন খ্যাতনামা ক্যামেরাম্যান। তখন ছিল স্লায়লেন্ট যুগ। এলো টকি। তিনি আর নাকি খাপখাওয়াতে পারলেন না নিজেকে। কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দেন, এ তো টকির যুগ নয়, খোশামোদির যুগ। এখন কী কেউ চাকরি করতে পারে!

ওয়ারিশ সূত্রে ল্যান্ডলর্ড ছিলেন মিস্টার খান। বাড়ি ভাড়া পেতেন শখানেক টাকা। বাকিটা চালাতেন স্বাধীন সাংবাদিকতা করে। কোনো সময় তিলের, কখনো বা হিলের সব সারপ্রাইজিং নিউজ।

সিনেমাগন্ধী কাগজগুলো তো লুফে নিত, আর পাকা সমজদার ছিল এই উদ্‌বাস্তুরা। যাত্রা, কবির পালা, জারি এদের কাছে এখন পুরান দলিল হয়ে উঠেছে। কতকটা যেন পড়া যায়, বাকিটা স্মরণ করতে চোখ করকর করে।

ওদের মূল্যবান অংশগুলো পোকায় কেটেছে!

ওরা যখন কোনো শহুরে গানের আসরে রেডিও অথবা মাইকে জারিগান কী ভাটিয়ালি গান শোনে তখন ওদের মনে হয় যেন ছিনালি করছে কেউ। কোথায়ই বা সেই নদী আর বিল-ঝিলের উদার পরিবেশ, কোথায়ই বা সেই গলা। এ শুধু সং সেজে রংবাজি করা।

তাই তো বাধ্য হয়ে ওরা তিলে ও হিলে মশগুল থাকে। এবং তাই মিস্টার খানের আজ স্মরণ নেওয়া। তিনি এসে রহস্য ভেদ করে দিলেন। তিলটি মেকিও নয়, আসলও নয়।

মজলিসের সবাই একেবারে লাফিয়ে উঠলেন।— তবে কি মিস্টার খান?

উনিশশ পঞ্চাশে যখন ওকে কেউ চিনত না, তখন কলকাতার শ্যামা ফিলিম এক বিজ্ঞাপন দিলে যে এক চারুদর্শনা তিলওয়ালা অভিনেত্রীর প্রয়োজন। ওর গালে ছিল একটি সূক্ষ্ম আঁচিল। সেইটা অপারেশন করতেই দাগটি হলো তিল। খরচ পড়েছিল— দাঁড়ান নোটবইটা দেখে বলছি— দুই-গিনি।

ধন্য! ধন্য! এজন্যই আপনাকে ডাকা।

ফি বাবদ মিস্টার খান পেলেন চা ও প্রচুর নাশতা। প্রতি ঘর থেকে চাঁদা তোলা হলো দুআনা করে। মেয়ে এবং পুরুষ সভ্যরা আলাপ-আলোচনা করলেন, চা খেলেন হই-হুল্লোড় করে। আঙুর দানার মতো কথা চিবালেন সবাই। ফুল আপা এবং রাবেয়া আপার গাল দিয়ে তো রস গড়িয়ে পড়ার জোগাড়!

এরপর ছেলেদের ডেকে শাসিয়ে দেওয়া হলো। ফুল আপাই ভার নিলেন। তোমাদের এসব ভারি অন্যায়। কারণ এখনও তোমাদের ঘাড়ের রোঁয়া গজাতে ঢের দেরি।

ছেলেরা রেগে বেগুনি হয়ে রইল।

আর রেগে রইল বাড়ির বেশিরভাগ বাসিন্দা— যারা মজলিসের সভ্য-সভ্যা নয়। চাঁদা দিয়ে মরল অথচ রহস্য জানতে পারল না তিলের।

তবু দুই-এক জন অল্পবয়সি বউ মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করল, ব্যাপার কী ফুল আপা? সত্যি কথাটা বলুন না? আমরা তো ঘরকন্না নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম।

তাই থাকো। সময়মতো শুনবে না, এখন হাই-পাই।

দিন কতক বেশ মনকষাকষি চলল। দুই-একটা হাইড্রোজেন বোমার কচি-কুচো সংস্করণও পড়ল। আঁচ দিয়ে এখানে তোলা উনানটা রেখেছেন কেন? আর রাখলে ভালো হবে না ফুল আপা। কেউ বলল, আমরা মানি বলেই ওর মান— না মানলে তিনি করবেন কী? আর বরদাস্ত করব না সব্বাইর ওপর ছড়ি বুলান।

আর একটি ছিপছিপে তরুণী গায়ে সাবান মাখতে মাখতে কুয়ো তলার প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে বলল, আজ আমি রাবেয়া আপাকে বারণ করে দিয়েছি, আমার ঘরের সুমুখে আদুল গায়ে বসে সকাল বেলা কয়লা ভাঙতে। কারণ দুই-তিন দিন দাড়ি কামাতে কামাতে ওর গাল কেটে-কুটে গেছে। সত্যি সত্যি একদিন যদি খুনখারাবি হয়।

কথা শেষ হওয়া মাত্র কুয়োতলা ঝমঝম করে উঠেছিল হাসিতে! কালো বউ চেয়েছিল সপ্রতিভ হয়ে।

বাংলাদেশের নানা জেলার উদ্‌বাস্তু এসে এ বাড়িটায় ভিড় জমিয়েছে। একশ থেকে তিন-চারশ পর্যন্ত এক এক জনার আয়। উপায় নেই বলেই এখানে মাথা গোঁজা। বাড়িওয়ালা একজন ভদ্র মাড়োয়ারি! পানি পায়খানা কিংবা নর্দমা সম্বন্ধে কোনো অভাব অভিযোগের কথা তিনি শুনলে বিনীতভাবে বলেন, এ তো কুলিদের ব্যারাক, আপনারা এখানে কেন থাকেন বাবুজি? মিনিস্টারের কাছে লিখুন, তিনি আপনাদের ইজ্জত বুঝবেন। একটা ভালা বন্দোবস্ত কোরে দিবেন কলোনিতে। কলের কুলিদের জন্য হামি এ ব্যারাক করেছিলাম, আপনারা কেন বেফায়দা এখানে এসে উঠলেন! হামি আর পয়সা খরচা করতে পারব না, মাপ করবেন।— রাম, রাম।

অনেক অসুবিধার মধ্যে একটা সুবিধা— এ বাড়ির উঠানখানা। প্রায় বিঘা দেড়েক জমি। ছেলেমেয়েরা খেলাধুলা করে, বউরা আঁচ দেয় তোলা উনানে। কেউ দেয় কাপড়জামা শুকাতে।

শৌখিন ইলা ভাবি ও গোলাম মওলা দুপাশে দুফালি ফুলের বাগান করেছেন। যখন বৈশাখের খর দ্বিপ্রহরে প্রায় পশ্চিমা লু চলে, তখনও এদের বাগানে দুই-একটি ডালিয়া উজ্জ্বল হয়ে ফোটে– এক আধটি বেল ফুল। তুমি আর একটু নজর করে দেখলে হয়তো দেখতে পাবে দুই-চার সার সিজন ফ্লাওয়ার। রঙিন প্রজাপতি যেন জ্বলজ্বল করছে।

সেই তিল নিয়ে তখনও মনকষাকষি চলছে।

নয়ন টেলিফোনে কাজ করে। আজ অফিসে যায়নি। সেই কুয়োতলার প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়েই সে বলে, ফুল আপার যে বয়সে যে রূপ তাতে সে ছাড়া কে লিড্ করবে? নজির আমাদের হাজেরা নানি।

মিতা কাজ করে জিপিও-তে। সে চোখ কপালে তোলে।— ও কথা বলিস নি, বলিস নি। তেমন কেউ শুনলে তোর চাকরি থাকবে না।

কেন?

নেকি! যেন কিছু জানে না। সিডিসাস্!

ফুল আপা সত্যই সুন্দরী। আয়ত চোখ, মুখের সঙ্গে মানানসই একটি নাক, গভীর বাঁকা ভুরু— দেখলে চোখ ফেরানো দায়। একরাশ কোঁকড়ানো কালো চুল তিনি অনেক সময়ই সামলাতে পারেন না। বয়স তাঁর পঁয়ত্রিশের কোঠা ছাড়িয়েছে। কিন্তু কে যেন মদ ঢেলে দিয়েছে রূপের এই অসময়। ছেলেরা মুগ্ধ হয়ে দেখে, প্রৌঢ়রা বিবশ হয় ও ফুল আপা এলে বুড়োরা আল্লার নাম করতে ভুলে যান। তবু এতদিন এমন করে অল্পবয়সি বউদের যেন নজরে পড়েননি ফুল আপা। আজ নয়ন ও মিতার কথায় যেন ওদের বুক টনটন করে ওঠে।

কালো বউ বলে, অমন ঘুরে ঘুরে বেড়ালে, কাজের আঁচটি পর্যন্ত গায়ে না লাগালে কার না স্বাস্থ্য ফেরে!

শিউলি মুখে ঘন সাবান মেখে বলে, যদি আমাদের মতো কোলে-কাঁখে দিতেন খোদা, দেখতাম কেমন করে অমন গড়নটি থাকে? যা-ই তোমরা বলো না কেন, ও বয়সে অমন জৌলুস মানায় না।

আর একটি বউ পা দুখানা ঘষতে ঘষতে বলে, খান কী জানো? শুধু ক্ষীর। চতুর্থ পক্ষের বউ, বুড়ো স্বোয়ামী হাঁটতে পারেন না, তবু নিত্য রাবড়ি এনে খাওয়ান। অমন খাওয়া পেলে— সে মুখ কুঁচকে কথা বন্ধ করে জোরে জোরে পা চালায়। আজ তার পায়ের ফাটাগুলো মোলায়েম করতেই হবে।

অন্য একটি রোগা লিকলিকে বউ কয়লামাখা হাত ধুয়ে বলে, দেখা যাবে বুড়ো ম'লে কতটা জৌলুস থাকে! বিয়ের আগে অনেকেরই অনেক কিছু ছিল রে।

এতক্ষণ বাদে নয়ন সায়াটা পরে মন্তব্য করে, আমরা যে-ই যা বলি নে কেন, তাতে কিন্তু সোনার দর কমে না। রূপ সকলে পায় না, আবার পেলেও তা অত বয়স পর্যন্ত সকলের ভাগ্যে টেকে না।

কালো বউ রেগে ওঠে, অত রূপসি হওয়াও আবার ভালো না। সংসার জ্বালায়। ফুল আপার ভাগ্য ভালো যে, চার কুলে কেউ নেই।

তিল ক্রমে তাল হয়ে ওঠে। আবার বসো আরম্ভ হয়। পুরুষদের বৈঠক হলে এতক্ষণে দুই-এক রাউন্ড হয়ে যেত। সময় বুঝে নয়ন ও মিতা সরে দাঁড়ায়। কালো বউ যখন কুয়োতলা ছাড়ে তখন তার মুখের দিকে চাওয়া যায় না।

আজ যে যার ঘরে গিয়ে বাক্স খুলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জামা-কাপড় নামায়। নিজের কৌটায় না থাকলেও ধার করে একটু পাউডার আনে। আলতা খোঁজে। সংসারী কাজকর্ম সেরে একটু প্রসাধন করে। সাজে-গোজে ইচ্ছামতো। তারপর আয়না খুলে মুখ দেখে বারবার। দুই-একজনার এ পর্বটা প্রায় উঠে গেছে ঢ্যাব্ ঢ্যাব্ কোলে আসার দরুন।

নয়ন ও মিতা নিত্য সাজে। আজ যেন সীমা ছাড়ায়।

কালো বউ ঠিক করে, আজ তার স্বামী ঘরে ঢুকলেই প্রশ্ন করবে, এ বাড়িতে সব চেয়ে কে সুন্দরী? অথচ ফুল আপা এসব কিছুই জানেন না।

সবে বিকেল পড়েছে। বোধ হয় তিনটা। এমন সময় একদল ভিখারি ঢোকে ব্যারাক বাড়িতে। হইচইয়ে সব ঘরের মেয়ে-বউ বেরিয়ে আসে। ভিখারির মতো গোলমাল তারা এ বাড়িতে আর শোনেনি কখনো।

তখনো পড়ন্ত রোদের জ্বালা কমেনি! সানে পা রাখা যায় না। উঠানটা মনে হচ্ছে যেন তামার তাতানো টাট।

মা ভিক্ষে দাও— মাগো...

সকলে বিরক্ত হয়ে চেয়ে থাকে। এমন অসময়েও এ উৎপাত!

ফুল আপা তার থেকে ওর সমস্ত কাপড়চোপড় ঠেলে সরিয়ে রাখেন। আজকাল কাউকে আর বিশ্বাস নেই।

বউ ও মেয়েরা চেয়ে দেখে ফুল আপা কোনো সজ্জা করেননি, না গায়ে দিয়েছেন একটা ব্লাউজ। শুধু ফরসা আঁচলখানা কোনো রকমে বুকে-পিঠে লেপটানো। উজ্জ্বল রৌদ্রে শরীরের রং যেন জ্বলছে। পাতলা শাড়ির ফাঁক দিয়ে ঈষৎ বিন্ম্র স্তনভার দুলছে। কী তার ডৌল! কী তার শোভা! ওরা ম্রিয়মাণ হয়ে থাকে। ওদের দুর্বল অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো যেন বিবশ হয়ে যায়।

ফুল আপা এসব ঠিক বুঝতে না পারলেও অনুমানে সহজাত বুদ্ধির প্রভায় কী যেন কী বোঝেন। তার যেটুকু আঁচল ইতোমধ্যে অসম্বৃত হয়েছিল, তা সম্বৃত করে নেন। সমস্ত ঘরগুলোর দিকে তাকান সগৌরবে।

একটি ভিখারি মেয়ে সুমুখে এসে বলে, মা চারটি ভিক্ষে দিন।

তার পিছন পিছন আরও কয়টি ছেলে-মেয়ে এসে দাঁড়ায়। রোদে বিবর্ণ হয়ে ঝলসে গেছে যেন এতগুলো রক্তমাংসের মানুষ।

ওরা আবার ভিক্ষে চায়।

কিন্তু ফুল আপা কিছু বলেন না। তিনি দাঁত খিঁচলেও ওরা আশ্চর্য হতো না— আশ্চর্য হয় ওরা চাউনি দেখে।

দলের মধ্যে একটি মেয়েই শুধু নীরব। তার দিকেই ফুল আপার দৃষ্টি ফেরানো। সে মেয়েটি রয়েছে প্রায় মাঝ উঠানে দাঁড়িয়ে।

দলসমেত ভিখারিরা এবার অবাক হয়ে চেয়ে দেখে কেবল এই মহিলা নয়, বাড়িসমেত দৃষ্টি ওর দিকে নিবদ্ধ।

একটা ফুটন্ত ডালিয়ার কাছে সমান গৌরবে এক কুড়ি-বাইশ বছরের মেয়ে যেন জ্বলছে। একটু লক্ষ করলেই চোখ ধাঁধায়।

অর্ধ শিক্ষিতা বউরা ভাবে, এই রূপই বুঝি ছিল পদ্মিনীর।

মিতা এবং নয়ন ভাবে, এই রূপেই বুঝি ধ্বংস হয়েছিল ট্রয় নগরী।

কিন্তু মেয়েটি ঠিক রূপসি কী না সন্দেহ। কারণ তার সর্ব অঙ্গ কবি কল্পনার নয়। বেশবাস একান্ত শ্রীহীন। তবে সে গনগন করছে প্রথম আঁচের মতো। অঙ্গার হয়নি, কিন্তু ভস্ম হতে যেন বসেছে। মেয়েটির সুমুখের উঁচু দাঁত দুটিতে যেন হীরার জেল্লা।

একে দেখে বাড়ির সবার আর একটি লোকের কথা মনে পড়ে— সে হচ্ছে ফুল আপার এক ভাইপো। কিছুদিন আগে এখানে এসেছিল। যেন তুলের তুল সাদৃশ্য।

ফুল আপা মেয়েটিকে ইশারায় কাছে ডাকেন।

এ বাড়ির সব বউরা ঝগড়া-তর্ক ভুলে এগিয়ে আসে। আশ্চর্য— ওকে কেউ আর যেন হিংসা করে না।

কাছে এলে সবাই দেখে, প্রথম আঁচের ওপর যেন একখানা পাতলা মেঘ-থমথম ধোঁয়ার কুয়াশা— তাই কারও জ্বলুনি বাড়ায় না।

কিন্তু জেল্লা হারায় সবাই। এমন যে ফুল আপা তিনিও। যেন হঠাৎ রাতে সূর্য উঠেছে। নিষ্প্রভ হয়ে গেছে জোনাকির ঝাঁক, রানি জোনাকি সমেত। হোক না কুয়াশা ঢাকা সূর্য।

মেয়েটি কাছে এলে ফুল আপা আপ্যায়ন করেন, বসো বসো এই পিঁড়িখানায়।

মেয়েটি সেই কাপড় জামাগুলোর দিকে একটিবার তাকিয়ে চুপ করে থাকে, যেন বসতে সাহস হচ্ছে না। অথচ টনটন করছে ওর উরুজোড়া, অপূর্ব ভঙ্গিমার কোমরটা।

একটি তেরো-চৌদ্দ বছরের কিশোরী মেয়ে, নাম পুষ্পি— যাকে এ বাড়ির সবাই ফাজিল বলেই জানে, সে বলে, দেখ দেখ ওর চোখের পালকগুলো গনা যায়। ওমা এ তো দেখিনি কখনো!

সবাই আবার ওর মুখের দিকে তাকায়।

ওর চোখে পানি।

ওমা কাঁদছ কেন? ফুল আপা বললেন, বসো বসো।

তবু কাপড়গুলোর দিকে চেয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব করে মেয়েটি।

ফুল আপা ইতস্ততের কারণটা বোঝেন।— তুমি কিছু মনে করো না, বসো বসো এই পিঁড়িখানায়।

ধরা গলায় মেয়েটি বলে, যদি ছোঁয়া লাগে?

এই জন্য বুঝি চোখে পানি? লাগবে না ছোঁয়া। আর লাগলেও কিছু হবে না। আমি ঠিক তোমাকে ভেবে কিছু করিনি।— ফুল আপা পরিস্থিতিটা হালকা করতে চেষ্টা করেন।

সেজন্য নয়, আমার কাপড়চোপড়ই। আবার নির্বাক হয়ে যায় মেয়েটি।

ছেঁড়া? তাতে কী হয়েছে? উঠে বসো।

পুষ্পি চোখ পিটপিট করে হাসে। সে ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে থুথু ফেলে।

মেয়েটির কাপড়ে একটা দাগ। ফুল আপা পুষ্পিকে একটা ধমক দেন, কিরে টক পালং? এখান থেকে দূর হ— তিনি মেয়েটিকে হাত ধরে বারান্দায় তোলেন। আবডালে নিয়ে যান দেওয়ালের।

বিষয়টা বুঝে বউরা একটু এদিক-ওদিক হয়ে যায়।

ফুল আপা ঘরে ঢুকে একখানা কাপড় এনে ওকে নিজেই কুয়াতলায় নিয়ে যান। একটু পরে মেয়েটি যখন বেরিয়ে আসে, তখন সবাই দেখে যে দশআনা কুয়াশা প্রায় কেটে গেছে। ওর সৌন্দর্য শুধু রূপে নয়— স্বাস্থ্যে।

সঙ্গীরা এবার জিজ্ঞেস করে, তুই কী এখানে থাকবি নাকি লো? এখন বসে থাকলে কে পেট চালাবে? মাগো, আমাদের কিছু দাও।

তখন প্রত্যেক ঘর থেকে কিছু কিছু চাল বার হয়। ওরা মামুলি শুভকামনা করে সকল বাসিন্দাদের। কিন্তু বুক জ্বলে যায় ছেলেবুড়ো সবারই।

কী হলো যাবি নি?

হ্যাঁ যাব— দাঁড়াও একটু। মা আমি চলি।

ফুল আপা বাধা দেন, না তুমি একটু পরে যাবে।

আমি যে পথ চিনিনে।— সে অসহায় ভাবে তাকায়।

কোথায় থাকো?

সদরঘাটে।

তা হলে এক ব্যবস্থা হবে। অনেক কথা আছে।

এমন সময় চোখে নীল গগলস্-আঁটা মিস্টার খান এসে উপস্থিত হন।

এ যে একেবারে ফিলিম ফিগার। কোথায় পেলেন একে ফুল আপা?

মেয়েটি কিছু বোঝে না।

খান জিজ্ঞেস করেন, তোমার নাম কী?

মেয়েটি চুপ করে থাকে।

ফুল আপা বলেন, বলো না, আমরাও শুনি।

হাসিনা।

চমৎকার। ভেরি সাজেস্টিভ।

এ সময় কোত্থেকে এলেন আপনি?— ফুল আপা জিজ্ঞেস করেন।

এই পথ দিয়েই যাচ্ছিলাম। ভাবলাম আপনার হাতের চা-টা খেয়ে যাই। প্রায় চারটা বাজে।— একটা সায়লেন্ট যুগের অতি পুরানো মেকের হাতঘড়ির দিকে তাকান মিস্টার খান।

বসুন বসুন উঠে। আমার হাতের চা কি খুব মিষ্টি?

চিনির টেস্ট চিনি টের পায় না, জানে অন্য সবাই।

তাই নাকি?

ফুল আপা দুজনকে প্রায় মুখোমুখি বসিয়ে রেখে ঘরের ভিতরে চলে যান।

বসো হাসিনা আমি আসছি।

মিস্টার খানের চোখে একজোড়া নীল চশমা। রোগা হাড়গিলে চেহারা। হাসিনাকে গিলে খাবে নাকি? ও মোড় ঘুরে বসে। কিন্তু তবু মনে হয়, ওর পিঠে এসে নীল ধারালো দৃষ্টি যেন বিঁধছে।

সঙ্গীরা কেউ নেই। ওর মুহূর্তে মনটা যেন কেমন করে ওঠে। ও কী যেন ভেবে উঠোনে নেমে দাঁড়ায়। তারপর গেট দিয়ে বেরিয়ে মরিয়া হয়ে ছুটতে থাকে।

বাড়িশুদ্ধ বউ-ঝিরা অবাক হয়ে যায়। তারা ছুটে গেট পর্যন্ত আসে। কিন্তু হাসিনা পিছন ফিরেও তাকায় না।

ফুল আপা বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করেন, কী হলো মিস্টার খান?

মেয়েটা পাগল।

কিন্তু একথা কেউ বিশ্বাস করতে পারে না।

এ বাড়ির যে-কেউ নয়, সেই চলে গেছে— তবু অনেকক্ষণ ধরে একটা শূন্যতা যেন বোবা কান্না কেঁদে ফেরে।

ছুটতে ছুটতে হাসিনা যেন তার বাল্যজীবনে চলে যায়। এই ইটকাঠের অট্টালিকা বাড়িঘর পেরিয়ে, পিচগলা রাস্তার জ্বালা ছাড়িয়ে— অনেক দূরে গ্রাম্যপথে। ফাগের মতো মাটি মোলায়েম ঠেকে পায়। সারা গায় স্নিগ্ধ ছায়া পড়ে বাঁশ, বাবলার, কখনো বা হরীতকী, আম, জাম, আমরুলের।

হাসিনা ছুটে চলে তার কৈশোরে।

লোহার সেতু পেরিয়ে এসেছে, এবার বাঁশের সাঁকো পার হয়। অগভীর খালের পানিতে জলো উদ্ভিদে ওর যেন মন কেড়ে নিতে চায়। ও খালে নেমে শ্রান্ত পা দুখানা ধুয়ে ওঠে। একটা অশথ গাছের ছায়ায় বসে। কান পেতে হরিয়ালের শিস শোনে। ফল খেতে এসেছে ওরা বিকেল বেলায়।

ও অনেকক্ষণ শুয়ে থাকে ঘাসে।

পাখিগুলো শুধু খায় না, খেয়ে-দেয়ে খেলা করে। জোড়া বেঁধে নাচে মগডালে। সন্ধ্যাবেলা ওদের শেষ হয় খেলা। কী যেন কী ভাষায় কথা বলে সঙ্গীদের সঙ্গে। তারপর ঝাঁক বেঁধে উড়ে যায়।

কোথায় যায় ওরা? অনেকক্ষণ পর হাসিনা ভাবে। ওদের কী বাড়িঘর আছে মানুষের মতো? নিশ্চয় আছে। কিন্তু কত দূরে? ও ভাবতে ভাবতে গহন কান্তার পেরিয়ে যায় কিশোরী মনের ডানা মেলে। তবু খুঁজে পায় না। আরও খোঁজা উচিত ছিল, কিন্তু সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে এসেছে যে। ও ভারি মন নিয়ে বাড়ির দিকে ফেরে।

প্রতিবেশী এক দাদি গল্প বলছে নাতনিদের নিয়ে। পাশে একটা ছাগল বাঁধা। একটা বিড়াল ঘুরছে মিউ মিউ করে। প্রদীপ নেই। চাঁদের আলোতেই আসর জমেছে। লেবু বনে জোনাকি জ্বলছে থোকায় থোকায়। ও জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁ দাদি, সন্ধেবেলা পাখিরা সব যায় কোথায়?

কেন ওদের বাসায়।

আমাদের মতো সব ঘরবাড়ি নাকি?